Pratidhwani the Echo
A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science
ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)
***Impact Factor: 6.28** (Index Copernicus International)*
Volume-IX, Issue-I, October 2020, Page No. 1-11
Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Karimganj, Assam, India
Website: http://www.thecho.in

রবীন্দ্রসাহিত্যে ও জীবনদর্শনে নববীক্ষণে শ্রীচৈতন্যদেব

মুনমুন দাস
গবেষক, বাংলা বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ

Abstract

Rabindranath Tagore one of the brightest star in Bengali literature, was fascinated by great personality of Sri Chaitanyadev. He congratulates Chaitanyadev's liberal humanity as he wanted to liberate the entire nation from the narrow-mindedness of communalism, and accept the vitality of Chaitanyadev's movement in nineteenth century India from historical point of view. In many of his novels and plays, characters have evolved in the form of Chaitanya images.He reviewed in his essays and letters Chaitanyadev's protesting entity and the ideology of the mass movement in formation of the national ideology for the liberation of subjugated India.Influence of Chaitanyadev how was reflected in every aspect of Rabindranath's life and literature such as novels, essays, plays, letters, poems and songs, this is reviewed with new vision in my article.

Keywords:** **Bengali literature, Rabindranath and Chaitanyadev, Chaitanya movement, liberal humanity, influence of Chaitanyadev, Rabindra literature.

রবীন্দ্রসাহিত্যে অর্থাৎ কাব্য, নাটক, প্রবন্ধ, গদ্যরচনা, উপন্যাস এবং গানেও বৈষ্ণব আদর্শের প্রভাব নিয়ে অল্পবিস্তর আলোচনা হয়েছে। কিন্তু এই পদাবলী গানের পুনর্জাগরণের মূলে যিনি, সেই চৈতন্যদেব সম্পর্কে তাঁর কী ধারণা ছিল সে সম্পর্কে বিশেষ কোনো আলোচনা হয় নি। অথচ যে পদাবলী গানের আকর্ষণে যৌবনে রবীন্দ্রনাথকে ভানুসিংহ সাজতে হয়েছিল, পদাবলীর নিবিড় শব্দ-ছন্দ যাঁর রক্তের মধ্যে, জীবনের সুখ-দুঃখ, আঘাত-বেদনা ও আনন্দের প্রকাশে যিনি বৈষ্ণব পদাবলীকে পরিশীলিত প্রতীকে তুলে ধরেন, বৈষ্ণব বাউল যাঁর অবধারিত অবলম্বন সেই রবীন্দ্রনাথ চৈতন্যদেবের জীবনাদর্শে, তাঁর ব্যক্তিত্বে কতখানি আগ্রহী ছিলেন সে সম্পর্কে স্বভাবতই আমাদের মনে কৌতূহল জাগে। আর সেই কৌতূহল নিরসনের তাগিদেই রবীন্দ্রনাথের জীবনদর্শনে ও সাহিত্যে শ্রীচৈতন্যদেবের প্রভাব কতখানি, রবীন্দ্র সৃষ্ট সাহিত্যে কীভাবে ঘটেছে চৈতন্য চরিত্রের বিনির্মাণ, কীভাবে রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টিতে নববীক্ষণে চৈতন্যদেবের আদর্শ ও ভাবনার প্রতিফলন ঘটেছে তা জানতে পুনরায় আমাদের একবার রবীন্দ্রসাহিত্যের পাতা ওল্টাতে হয়।

শ্রীচৈতন্যদেবের দৃঢ় ব্যক্তিত্ব এবং জীবনাদর্শে রবীন্দ্রনাথ কতটা মুগ্ধ ছিলেন তা বোঝা যায় 'বিদ্যাসাগর চরিত' প্রবন্ধে শ্রীচৈতন্যদেব সম্পর্কে তাঁর মন্তব্যে। এই প্রবন্ধে চৈতন্যদেবের গৌরবময় কর্মকুশলতা স্মরণ করে রবীন্দ্রনাথ আশা প্রকাশ করেছেন এরকম বলিষ্ঠ চরিত্র মানুষের আবির্ভাবেই বাংলাদেশের যাবতীয় দুর্বলতার অপবাদ ঘুচতে পারে - "বহুকালপূর্বে একদা নবদ্বীপের শচীমাতার এক প্রবল দুরন্ত ছেলে এই আশা পূর্ণ করিয়াছিলেন।" [১]

চৈতন্যদেব ছিলেন জন-গণ-মন অধিনায়ক। প্রেমভক্তি দানের মাধ্যমে সকলকে একসূত্রে গ্রথিত করাই ছিল তাঁর লক্ষ্য। রবীন্দ্রনাথ চৈতন্যদেবের এই প্রেমভক্তির মানবরূপকে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন, তাঁর বিরাট মানবিকতার স্বরূপটি উপলবদ্ধি করে লিখেছেন - "আমাদের বাঙ্গালির মধ্য হইতেই তো চৈতন্য জন্মিয়াছিলেন। তিনি তো বিঘাকাঠার মধ্যে বাস করিতেন না, তিনি তো সমস্ত মানবকে আপনার করিয়াছিলেন। তিনি বিস্তৃত মানবপ্রেমে বঙ্গভূমিকে জ্যোতির্ময়ী করিয়া তুলিয়াছিলেন। .....। তখন এমন কথা কী করিয়া বাহির হইল ---

"মার খেয়েছি না হয় আরও খাব,
তাই বলে কি প্রেম দিব না, আয়।"[২]

এই প্রেম উদার সার্বভৌম। চৈতন্যদেবই এই প্রেমধর্মের উৎস। চৈতন্যভাবনার এই বিরাট দিকটি রবীন্দ্রনাথকে আকৃষ্ট করেছিল। সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণ দৃষ্টি থেকে মুক্ত হয়ে চৈতন্য যে ভালবাসার ধর্মে জাতিকে উজ্জীবিত করতে চেয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ তাকেই অভিনন্দন জানিয়েছেন ....."আসল কথা, বাংলায় সেই একদিন সমস্ত একাকার হইবার জো হইয়াছিল। ...দেখিতে দেখিতে এমনি একাকার হইল যে, জাতি রহিল না, কুল রহিল না, হিন্দু-মুসলমানেও প্রভেদ রহিল না।"[৩] চৈতন্যদেবের মতো রবীন্দ্রনাথও হিন্দু-মুসলিম সাম্প্রদায়িকতার উর্ধ্বে মানবতার জয়গান রচনা করেছেন।

রবীন্দ্রনাথ লক্ষ করেছিলেন রক্ষণশীলতা দেশের মুক্তির প্রতিবন্ধক। আবার অন্ধ বিদেশী অনুকরণকেও তিনি ধিক্কার দিয়েছিলেন। শ্রীচৈতন্যদেব একদিকে যেমন জাতিভেদ প্রথার বিরূদ্ধে অপরদিকে গোঁড়া ব্রাহ্মণের অন্ধ আনুগত্যের মূলেও আঘাত করেছিলেন। এই আঘাতেই সেদিন বাংলাদেশ জেগে উঠেছিল, সেই প্রথম বাঙালি জাতি অন্ধ আনুগত্যের বেড়াজাল ডিঙিয়ে বৃহৎ স্বার্থে 'চণ্ডীমণ্ডপ' থেকে নিজেকে 'পৃথিবীর মাঝখানে' এনে দাঁড় করিয়েছিল। চৈতন্য আন্দোলনের তাৎপর্য আবিষ্কার করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ চিঠিপত্রের ষষ্ঠ পত্রে বলেছেন যে সেদিন বাঙালি জাতিকে "আপন আপন বাঁশ বাগানের পার্শ্বস্থ ভদ্রাসনবাটির মনসা-সিজের বেড়া ডিঙ্গাইয়া পৃথিবীর মাঝখানে আসিতে কে আহ্বান করিল এবং সে আহ্বানে সকলে সাড়া দিল কি করিয়া?"[৪] সেই আহ্বানে সকলে সাড়া দিয়েছিল অন্তরের তাগিদে, ভালোবাসার টানে। সেই আহ্বানে এমন কিছু ছিল যা মানুষকে ধর্মাধর্ম, জাত-কুলাদি বিচার ভুলিয়ে দিয়েছিল, তাকে 'বৈঠকখানা' থেকে 'রাজপথে' বের করে এনেছিল। আর এই অসম্ভবকে যিনি সম্ভব করেছিলেন তিনি আর কেউ নন, আমাদের অতিপরিচিত বাংলাদেশের নবদ্বীপে শচীমাতার কোলে বেড়ে ওঠা নিমাই। রবীন্দ্রনাথের মুখে আমরা তাঁর গৌরব কীর্তির কথাই শুনতে পাই - " একজন বাঙালি আসিয়া একদিন বাংলাদেশকে তো পথে বাহির করিয়াছিল। .....। বাংলার সে এক গৌরবের দিন। ..... সে আপন তেজে তেজস্বী হইয়া উঠিয়াছিল।"[৫]

চৈতন্যদেব আপন তেজে বঙ্গবাসীকে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন – এই তেজ আত্মশক্তি জাত । রবীন্দ্রনাথও আপন তেজে বঙ্গবাসীকে কূপমণ্ডুকতা থেকে বেরিয়ে মননচর্চায় যোগ দিতে উৎসাহ দিয়েছিলেন। উনিশ শতকে বাঙ্গালির অগ্রগতিতে এই আত্মশক্তির উদ্বোধন আধুনিকতার প্রকাশ। আর এই দিক থেকে চৈতন্যদেব ও রবীন্দ্রনাথ আধুনিকতার প্রতীক।

চৈতন্যদেবের আবির্ভাবে ধর্মে, সাহিত্যে সর্বোপরি কীর্তন সঙ্গীতের মাধ্যমে একদা বাঙালি জাতির মধ্যে যে মহাভাব জেগে উঠেছিল, তাদের মন যে একসূত্রে গ্রথিত হয়েছিল উনিশ শতকে পরাধীন ভারতবর্ষে সেদিন আবার ফিরে আসবে বলে আশা প্রকাশ করেছেন রবীন্দ্রনাথ – "তাই আশা হইতেছে, আর একদিন হয়তো আমরা একই মত্ততায় পাগল হইয়া সহসা এক জাতি হইয়া উঠিতে পারিব। বৈঠকি ধ্রুপদ খেয়াল ছাড়িয়া রাজপথী কীর্তন গাহিতে পারিব। ...সেই আর একদিন বাংলা একাকার হইবে।"[৬]

এ থেকে বোঝা যায় চৈতন্যদেব যে ভাবান্দোলনের দূত হয়ে এসেছিলেন, বৈঠকি ধ্রুপদ ছেড়ে রাজপথী কীর্তনের বন্যা বইয়ে দিয়েছিলেন, উনিশ শতকের পরাধীন চেতনায় সেই ভাবান্দোলনের প্রাণশক্তিকে, সেই একাত্মবোধের প্রমত্ততাকে ঐতিহাসিক কারণেই রবীন্দ্রনাথ মনে প্রাণে চাইছেন। ঔপনিবেশিক শাসনের দাসত্ব থেকে যে মুক্তির আকাঙ্ক্ষা জেগেছিল, স্বাধীন হবার জন্যে যে বৃহৎ ভাবের সঙ্গে একাত্মবোধের প্রয়োজন ছিল সেই চিন্তার সূত্রেই চৈতন্যদেবের ভাবান্দোলন রবীন্দ্রনাথের কাছে তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠেছিল। চৈতন্যদেবের বিস্তৃত মানবপ্রেমের ঐতিহাসিক তাৎপর্য এখানেই।

রবীন্দ্রনাথ চৈতন্যদেবের এই ভাব প্রকাশের মধ্যে সঙ্গীতের অসামান্য ভূমিকা লক্ষ করেছিলেন। চৈতন্যদেব যখন দেশের মধ্যে ভাববন্যা নিয়ে এলেন সঙ্গীত তার সহযোগী হয়ে উঠল। আর বৈঠকী গীত নয়, সঙ্গীত নেমে এল সাধারণের মধ্যে। চৈতন্যদেব কীর্তনকে নগরসংকীর্তনে পরিণত করলেন। এই কীর্তন বৈষ্ণবের শস্ত্র ও শাস্ত্র দুইই। রবীন্দ্রনাথ গানকে তাঁর জীবনে শস্ত্রের মর্যাদাই দিয়েছিলেন। আমরা জানি বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময় রবীন্দ্রনাথ ভাববন্যা এনেছিলেন এই গানের মাধ্যমেই। রাজপথে তখন রবীন্দ্রগীতি হয়ে উঠল ঐক্যের প্রেরণার প্রতীক। রবীন্দ্রসঙ্গীত কণ্ঠে নিয়েই ভারতবর্ষ স্বাধীন হয়ে উঠল।

ষোড়শ শতাব্দীতে শ্রীচৈতন্যদেবের প্রত্যক্ষ প্রভাবে বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্যের সুবর্ণযুগ রচিত হয়। চৈতন্যদেবের প্রভাবে যে পদাবলী সাহিত্য ভক্তি ও কবিত্বের তুঙ্গ শিখর স্পর্শ করেছিল সেই পদাবলী রবীন্দ্রনাথের হাতে আরও গভীর ও ব্যাপক মাত্রা লাভ করল। 'চণ্ডীদাস-বিদ্যাপতি-রায়ের নাটকগীতি গায় শুনে পরমানন্দ' চৈতন্যের সেই আনন্দ রবীন্দ্রনাথেও বর্তেছিল 'ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী' যার পরিণাম। তবে বৈষ্ণব কবিতার ধর্মীয় ভাবাদর্শকে পরিহার করে তার প্রেমভাবনার মানবিক রূপটিকে গ্রহণ করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। পদাবলীর রসাবেদন ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্য রবীন্দ্রনাথের কবিচেতনাকে গভীরভাবে আলোড়িত করেছিল। পরবর্তীকালে রবীন্দ্রকবিতার ভাবে-আঙ্গিকে-রসাস্বাদনে বৈষ্ণব পদাবলীর ভাষা-ভাব-সুর-ছন্দ-রূপকল্প নতুন নতুন তাৎপর্য লাভ করেছে।

বৈষ্ণব পদাবলীর প্রেম ও প্রকৃতি বর্ণনার যে অনুভাবনা ধীরে ধীরে কবির মনে দানা বেঁধেছে, তারই স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ দেখা যায় 'মানসী'র বেশ কয়েকটি কবিতায় –

"আজও আছে বৃন্দাবন মানবের মনে -
শরতের পূর্ণিমায়
শ্রাবণের বরিষায়
উঠে বিরহের গাঁথা বনে উপবনে ।
এখনও সে বাঁশি বাজে যমুনার তীরে -
এখনও প্রেমের খেলা
সারানিশি সারাবেলা,
এখনো কাঁদিছে রাধা হৃদয় কুটীরে।"[৭]

সেকালের বৈষ্ণব কবিদের রচনার রসমাধুর্য একালে বসে মর্মে মর্মে আস্বাদন করেছেন রবীন্দ্রনাথ। 'পত্র', 'শ্রাবণের পত্র', 'বর্ষার দিনে' প্রভৃতি কবিতায় বর্ষণমুখর দিনের হৃদয়াবেগ মথিত পুরনো স্মৃতির খেয়ায় আপনা থেকেই চলে এসেছে বৈষ্ণব পদাবলীর প্রসঙ্গ -----

"মনে পড়ে বরিষার বৃন্দাবন অভিসার
একাকিনী রাধিকার চকিত চরণ –
শ্যামল তমাল তল, নীল যমুনার জল,
আর দুটি ছলছল নলিন নয়ন।

এ ভরা বাদর দিনে কে বাঁচিবে শ্যাম বিনে,
কাননের পথ চিনে মন যেতে চায়।
বিজন যমুনাকূলে বিকশিত নীপমূলে
কাঁদিয়া পরাণ বুলে বিরহ ব্যথায় ।" [৮]

'সোনার তরী'র 'বর্ষাযাপন' কবিতাতেও বর্ষণমুখর প্রকৃতির পটভূমিতে কবির কাছে উপভোগ্য হয়ে উঠেছে 'গীতগোবিন্দ', গোবিন্দদাসের পদাবলী। ---" বর্ষা আসে ঘন রোলে, যত্নে টেনে লই কোলে।/ গোবিন্দদাসের পদাবলী।/ সুর করিয়া বার বার পড়ি বর্ষা অভিসার -/ অন্ধকার যমুনার তীর।/ নিশীথে নবীনা রাধা নাহি মানে কোনো বাধা,/ খুঁজিতেছে নিকুঞ্জ কুটীর। ...../ আষাঢ় হতেছে শেষ, মিশায়ে মল্লার দেশ/ রচি 'ভরা বাদরের' সুর / খুলিয়া প্রথম পাতা; গীতগোবিন্দের গাথা/ গাহি 'মেঘ অম্বর মেদুর'।/ স্তব্ধ রাত্রি দ্বিপ্রহরে ঝুপঝুপ বৃষ্টি পড়ে-/ শুয়ে শুয়ে সুখ অনিদ্রায়/ 'রজনী শাঙন ঘন ঘন দেয়া গরজন'/ সেই গান মনে পড়ে যায়।"[৯]

পদাবলীর প্রকৃতিচেতনা তাঁর সৌন্দর্য ব্যাকুল কবি মানসকে একদিকে যেমন উতলা করেছে, অপরদিকে ধর্মীয় সংস্কারের গণ্ডী ছাড়িয়ে রাধার বিরহবেদনা নতুন তাৎপর্য লাভ করেছে তাঁর হাতে। বৃহত্তর সাধারণ পাঠকের কাছে তত্ত্ব-দর্শন অপেক্ষা বৈষ্ণব পদাবলীর প্রকৃত মানবিক প্রেমই অনেকবেশি গ্রহণযোগ্য। তাছাড়া গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের পরিমণ্ডলে পদ রচনা করলেও বৈষ্ণব কবিদের কবিমনের অবচেতনায় ব্যক্তিগত প্রেমভাবনার সংমিশ্রণ ছিল অবশ্যই। আর তাই বৈষ্ণব কবিদের উদ্দেশ্য করে 'সোনার তরী'র 'বৈষ্ণব কবিতা'য় রবীন্দ্রনাথের জিজ্ঞাসা –"সত্য করে কহ মোরে হে বৈষ্ণব কবি,/ কোথা তুমি পেয়েছিলে এই প্রেমচ্ছবি,/ ...../ হেরি কাহার নয়ান রাধিকার অশ্রু আঁখি পড়েছিল মনে।.../ এত প্রেমকথা - / রাধিকার চিত্তদীর্ণ তীব্র ব্যাকুলতা/ চুরি করি লইয়াছ কার মুখ, কার/ আঁখি হতে।আজ তার নাহি অধিকার/ সে সংগীতে।"[১০]

তিনি আরও জানতে চেয়েছেন - "শুধু বৈকুণ্ঠের তরে বৈষ্ণবের গান!/ পূর্বরাগ, অনুরাগ, মান-অভিমান,/ অভিসার, প্রেমলীলা, বিরহ-মিলন,/ বৃন্দাবন গাথা-এই প্রণয় স্বপন/ একি শুধু দেবতার!/ এ সঙ্গীত রসধারা নহে মিটাবার/ দীন মর্ত্যবাসী এই নরনারীদের/ প্রতি রজনীর আর প্রতি দিবসের প্রেমতৃষা।"[১১] একালের কবি মানবের মাঝেই ভগবানকে উপলব্ধি করেন, মানব প্রেমের মধ্যেই ভগবৎ প্রেমের রূপ প্রত্যক্ষ করেন। মানুষের মধ্যে দেবতাকে নামিয়ে আনতে পেরেছিল বৈষ্ণবধর্ম। কৃষ্ণদাস কবিরাজ লিখেছেন-

"কৃষ্ণের যতেক খেলা সর্বোত্তম নরলীলা
নরবপু তাহার স্বরূপ।"[১২]

তারই নবতর ভাষ্য রচনা করে একালের কবি বৈষ্ণব কবিতা সম্পর্কে লেখেন – "দেবতারে যাহা দিতে পারি, দিই তাই/প্রিয়জনে- প্রিয়জনে যাহা দিতে পারি / তাই দিই দেবতারে; আর পাবে কোথা! / দেবতারে প্রিয় করি, প্রিয়েরে দেবতা।" [১৩] বিশ্ব প্রকৃতির অনন্ত সৌন্দর্যের মধ্যে মানবলীলার চিরন্তন প্রেমের যে রহস্যময় উৎসার, বৈষ্ণব কবিতায় তাকেই নতুনভাবে উপলব্ধি করেছেন রবীন্দ্রনাথ।

শুধুমাত্র সংগীত নয়, নাটকেও শ্রীচৈতন্যদেবের অনুরাগ লক্ষ করা যায়। তিনি রামানন্দ রায়ের 'জগন্নাথ বল্লভ' নাটক গেয়ে শুনে বিভোর হতেন। এমনকি তাঁরই নির্দেশে রূপগোস্বামী 'বিদগ্ধমাধব', 'ললিতমাধব'নাটক রচনা করেন। এমনকি 'শ্রীচৈতন্যভাগবতে'র মধ্যখণ্ডের অষ্টাদশ অধ্যায়ে আমরা দেখতে পাই চৈতন্যদেব রীতিমতো চন্দ্রশেখর আচার্যের বাড়িতে নাটক অভিনয় করতেন – " সদাশিব বুধিমন্ত খানেরে ডাকিয়া।/ বলিলেন প্রভু কাছে সজ্জ কর গিয়া।।/.....। গদাধর কাছিবেন রুক্মিণীর কাছ।/... নিত্যানন্দ হইবেন বড়াই আমার।/ ..... প্রভু বোলে পাত্র সিংহাসনে গোপীনাথ।/ ..... লক্ষ্মী বেশে অঙ্ক নৃত্য করিব ঠাকুর।/ সকল বৈষ্ণবের রঙ্গ বাড়িল প্রচুর। "[১৪]

এবারে শ্রীচৈতন্যদেবের অভিনয়প্রীতির সূত্রে রবীন্দ্রনাথের অভিনয় প্রীতির প্রসঙ্গ টানা যাক। নাটক রচনায় ও অভিনয়ে তাঁর বিপুল প্রয়াস বাংলা নাট্যচর্চায় একটি উজ্জ্বল অধ্যায়। রবীন্দ্রনাথ তাঁর সুদীর্ঘ জীবনে বহুবিধ নাটক রচনা করেছেন। 'বাল্মীকি প্রতিভা', 'চিত্রাঙ্গদা', 'চণ্ডালিকা', 'রাজা', 'ডাকঘর', 'রক্তকরবী' প্রভৃতি কাব্যনাট্য, নৃত্যনাট্য, রূপক-সাঙ্কেতিক বিবিধ আঙ্গিকের নাটক তিনি রচনা করেছেন। এগুলির মধ্যে অনেক নাটক রবীন্দ্রনাথ নিজে পরিচালনা করে মঞ্চে উপস্থাপন করেছেন এবং নিজে অভিনয়ও করেছেন বিভিন্ন ভূমিকায়। প্রশান্ত কুমার পাল 'রবিজীবনী'র দ্বিতীয় খণ্ডে লিখেছেন – "কলকাতায় আছেন রবীন্দ্রনাথ 'বিসর্জন' অভিনয়ের জন্য। সেই একই কারণ বিশ্বভারতীর অর্থের প্রয়োজন.....তবে এ কথাও সত্য, অভিনয় করে অভিনয় করিয়ে কবি নিজেও প্রভূত আনন্দ পেতেন- সেটা তাঁর আর্টিস্ট সত্তার সম্ভোগ...।"[১৫]

রবীন্দ্রনাথের সৃষ্ট ঠাকুরদা, ধনঞ্জয় বৈরাগী, বিশু পাগল প্রভৃতি চরিত্রগুলিতে চৈতন্যদেবের প্রভাব লক্ষ করা যায়। চৈতন্যদেব বার বার নিজেকে বাউল বলে পরিচয় দিয়েছেন। এই চরিত্রগুলিও খানিকটা সেই ধরনের। চৈতন্যদেব যেমন প্রেমভক্তি দানের মাধ্যমে সকলকে কাছে টানতে চেয়েছিলেন তেমনি রবীন্দ্রসৃষ্ট এই চরিত্রগুলিও ভালবাসা ও আনন্দ দিয়েই মানুষের মন জয় করতে চেয়েছে। চৈতন্যদেব যখন সাঙ্গোপাঙ্গোদের নিয়ে চলতেন তখন সতীর্থরা তো ভরসা পেতেন, আশ্রয় পেতেন তাঁর কাছে। রবীন্দনাথের ধনঞ্জয় বৈরাগী কি সেই জাতীয় চরিত্র নয়? শিবতরাইয়ের অধিবাসীরা তো, ধনঞ্জয় বৈরাগীর কাছেই পাঠ নিয়েছিলেন। তাই নিঃসন্দেহে বলা যায় রবীন্দ্রনাথের এই জাতীয় চরিত্র পরিকল্পনার আভাস চৈতন্য চিত্র ও চরিত্রের মধ্যেই ছিল।

চৈতন্যদেবের বিবিধ গুনাবলী রবীন্দ্রনাথকে মুগ্ধ করেছিল। রবীন্দ্রনাথ চৈতন্যের জীবনের অলৌকিকতা মেনে নিতে পারেননি। কিন্তু চৈতন্যের শিল্পানুরাগকে তিনি নিশ্চয়ই পছন্দ করেছিলেন। চৈতন্যদেবের প্রেমভক্তির মানবরূপকে তিনি শুধু শ্রদ্ধাই করেননি, মধ্যযুগের বাংলাদেশে সাহিত্য সঙ্গীত ধর্ম সমাজ সংস্কৃতিতে যে বাঁধভাঙা প্লাবন এসেছিল চৈতন্য রেণেসাঁর সেই মহিমাময় দিকটি রবীন্দ্রনাথের রচনায় বার বার স্বীকৃতি পেয়েছে।

অনেকে মনে করেন রবীন্দ্রনাথ ও চৈতন্যদেব বিপরীত স্বভাবের মানুষ। জীবনের সুখ দুঃখ আনন্দ-বিরহ ও ঈশ্বরানুভবকে চৈতন্যদেব ভাবোন্মাদনায় প্রকাশ করেছেন, রবীন্দ্রনাথ সমজাতীয় অভিজ্ঞতাকে কাব্যে, গানে, প্রতীক-প্রতিমানে প্রকাশ করেছেন। চৈতন্যদেব সন্ন্যাস নিয়েছিলেন, আর রবীন্দ্রনাথ তো বলেই দিয়েছেন তাঁর মুক্তি বৈরাগ্য সাধনে নয়, মোহই তাঁর মুক্তি, প্রেমই তাঁর ভক্তি। সমালোচক উজ্জ্বলকুমার মজুমদারের মতে, "সম্পূর্ণ বিপরীত চরিত্রের এই মানুষটিকে ব্যক্তিহিসাবে রবীন্দ্রনাথের ভাল না লাগারই কথা। কিন্তু ঈশ্বরানুভবের ব্যাকুলতায় রবীন্দ্রনাথের অন্তর্মুখী মানসজগতের চেহারাটা কিন্তু ভাবোন্মাদনারই অনুরূপ।" [১৬]

'গীতাঞ্জলি'র একটি বিখ্যাত গানে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন –"গায়ে আমার পুলক লাগে চোখে ঘনায় ঘোর/ হৃদয়ে মোর কে বেঁধেছে রাঙা রাখীর ডোর? / .....আনন্দ আজ কিসের ছলে / কাঁদিতে চায় নয়ন জলে/ বিরহ আজ মধুর হয়ে করেছে প্রাণ ভোর।" [১৭] এই যে নিরন্তর তাঁকে মনের মাঝে খুঁজে চলা, আনন্দে নয়নাশ্রু বিগলিত হওয়া, চোখে ঘোর লাগা মধুর বিরহের পুলক শিহরণের যে ছবিটি এই গানের মধ্যে ফুটে উঠেছে তার সঙ্গে কৃষ্ণপ্রেমের বিরহে ব্যাকুল 'সর্ব অঙ্গে কম্প পুলকে পূর্ণিত' চৈতন্যদেবের খুব একটা পার্থক্য নেই বলেই মনে হয়।

এই পরিপ্রেক্ষিতে আমরা রবীন্দ্রনাথের আর একটি গানের উল্লেখ করতে পারি ---

"তুমি নব নব রূপে এসো প্রাণে,
এসো গন্ধে বরণে এসো গানে।
এসো অঙ্গে পুলকময় পরশে,

এসো চিত্তে সুধাময় হরষে,
এসো মুগ্ধ মুদিত দু'নয়ানে।।"[১৮]

চৈতন্যদেবের প্রেমঘন রূপচিত্রটি অনন্ত দেশকালের পটভূমিতে মূর্ত হয়ে উঠেছে গীতিমাল্যের ১০৮ সংখ্যক কবিতায় – 'আকাশে দুই হাতে প্রেম বিলায় ও কে ।'[১৯] ঈশ্বরকে দেবতার ঐশ্বর্যজ্ঞানে না দেখে প্রেমভক্তির সম্পর্কে দেখার যে বৈষ্ণবতত্ত্ব 'চৈতন্যচরিতামৃতে'র মধ্যলীলার অষ্টম ও ঊনবিংশ পরিচ্ছেদে বর্ণিত হয়েছে 'গীতাঞ্জলি'র ৯২ সংখ্যক কবিতায় - 'দেবতা জেনে দূরে রই দাঁড়ায়ে/ আপন জেনে আদর করিনে' [২০] তাই যেন আভাসিত হয়েছে।

আবার, শ্রীচৈতন্যদেব প্রবর্তিত নামকীর্তনের কথা যদি আমরা ভাবি তাহলে দেখতে পাব রবীন্দ্রনাথের ভাবনাতেও নামের মাহাত্ম্য স্বীকৃতি পেয়েছে ---

"তোমারি নাম বলব নানা ছলে।
বলব একা বসে আপন মনের ছায়াতলে ।

.....

বিনা প্রয়োজনের ডাকে ডাকব তোমার নাম,
সেই ডাকে মোর শুধু শুধুই পূরবে মনস্কাম।" [২১]

রবীন্দ্রনাথ সারা জীবন সীমার মাঝেই অসীমের সন্ধান করে গেছেন। তাঁর সেই বিখ্যাত গানটির কথা যদি আমরা স্মরণ করি –

"সীমার মাঝে, অসীম, তুমি বাজাও আপন সুর –
আমার মাঝে তোমার প্রকাশ তাই এত মধুর।।
কত বর্ণে কত গন্ধে কত গানে কত ছন্দে
অরূপ তোমার রূপের লীলায় জাগে হৃদয়পুর।
আমার মধ্যে তোমার শোভা এমন সুমধুর।।" [২২]

এখানে আমাদের মনে পড়ে যায় 'অন্তঃকৃষ্ণ বহির্গৌর' শ্রীচৈতন্যদেবের কথা। 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে' কৃষ্ণদাস কবিরাজ চৈতন্যের আবির্ভাবের কারণ ব্যাখ্যা করে বলেছেন-

"রাধাকৃষ্ণ এক আত্মা দুই দেহ ধরি।
অন্যোন্যে বিলসে রস আস্বাদন করি।।
সেই দুই এক এবে চৈতন্য গোসাই ।
ভাব আস্বাদিতে দোঁহে হইলা এক ঠাঁই।।"[২৩]

রাধাভাবকান্তি বিশিষ্ট শ্রীচৈতন্যদেবের মধ্যেই শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য রসের প্রকাশ – এ যেন রবীন্দ্রনাথের 'আমার মধ্যে তোমার প্রকাশ তাই এত মধুর'। এইখানে রবীন্দ্রনাথের চিন্তা-চেতনার সঙ্গে শ্রীচৈতন্যদেবের সাধ্য-সাধনার মিল লক্ষ করা যায়।

শুধু তাই নয়, চৈতন্যদেবের কর্মধারার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের কার্যধারারও মিল লক্ষ করা যায় বিবিধ প্রসঙ্গে। ভক্তিপথের পথিক চৈতন্যদেব সরল বিশ্বাসের স্থানে 'কুটিল ভাষ্যের প্রাদুর্ভাব' মেনে নিতে পারেননি। তিনি শাস্ত্রের জীর্ণ অংশকে ছেটে ফেলতে চেয়েছিলেন। তাই বাসুদেব সার্বভৌমের কাছে একটানা সাতদিন বেদান্ত শ্রবণ করেও যখন ভাল-মন্দ কোনো উত্তর তিনি করেন নি তখন বাসুদেব সার্বভৌম বিস্ময় প্রকাশ করলে শ্রীচৈতন্যদেব তাকে বলেছিলেন – "প্রভু কহে সূত্রের অর্থ বুঝিয়ে নির্মল।/ তোমার ব্যাখ্যা শুনি মন হয় ত বিকল।।/ সূত্রের অর্থ ভাষ্য কহে প্রকাশিয়া।/ ভাষ্য কহ তুমি সূত্রের অর্থ আচ্ছাদিয়া।।..... মুখ্যার্থ ছাড়িয়া কর

গৌণার্থ কল্পনা।/ অভিধা-বৃত্তি ছাড়ি শব্দের কর লক্ষণা।।/ ..... ব্যাসের সূত্রের অর্থ সূর্যের কিরণ।/ স্বকল্পিত ভাষ্যমেঘে করে আচ্ছাদন।।" [২৪] এখানে দেখা যায় চৈতন্যদেব সূর্যের কিরণের ন্যায় ব্যাস সূত্রের সহজ সরল নির্মল ভাষ্যের পরিবর্তে কল্পনার মেঘে আচ্ছাদিত দুরূহ ভাষ্য গ্রহণ করেন নি।

রবীন্দ্রনাথ চৈতন্যদেবের নিরহঙ্কার শাস্ত্র প্রীতি লক্ষ করেছিলেন। তাঁকে মুগ্ধ করেছিল চৈতন্যের হৃদয়বত্তা। রবীন্দ্রনাথও সর্বদাই কোনো বিষয়ের দুরূহ জটিল ব্যাখ্যার পরিবর্তে সহজ সরল ব্যাখ্যাকেই সমর্থন করেছেন। তিনি লক্ষ করেছিলেন একজাতীয় আধ্যাত্মিক কুয়াশা সমাজকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে। সাহিত্য থেকে সৌন্দর্য, বৈচিত্র্য, সত্য লোপ পেয়ে যাচ্ছে। যে আধ্যাত্মিক কুয়াশা, নব্য হিন্দুয়ানি জাতির জীবনকে রূদ্ধ আড়ষ্ট করে ফেলেছে সেই কুয়াশা থেকে বেরিয়ে আসবার জন্য রবীন্দ্রনাথ বাঙ্গালিকে সূর্যের মতো 'সর্বতোচক্ষু' হতে বলেছেন। সংস্কার, অন্ধ বিশ্বাস, প্রথানুগত্য থেকে মুক্ত হতে বলেছেন।

এইভাবে রবীন্দ্র সৃষ্ট সাহিত্যে আমরা চৈতন্যদেবের ভক্তিভাবনা ও কর্মভাবনার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের চিন্তা-চেতনা ও কার্যধারার মিল খুঁজে পাই। কেবল তাই নয়, তাঁর সৃষ্ট উপন্যাসের চরিত্রগুলির উপরও চৈতন্যব্যক্তিত্বের প্রভাবের প্রতিফলন লক্ষ করা যায়। চৈতন্যদেব বিশ্বপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে সর্ব জাতি-ধর্ম-বর্ণের মধ্যে সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথও মানবপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে সাম্যবাদের কথাই মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে চেয়েছিলেন। তারই নমুনা আমরা 'বউ ঠাকুরাণীর হাট' উপন্যাসে দেখতে পাই। উপন্যাসের বসন্ত রায় চরিত্রটিকে রবীন্দ্রনাথ প্রেম ও ভক্তির মূর্তিমান স্বরূপে গড়ে তুলেছেন। দেখা যায় বসন্ত রায় তাঁর মৃত্যুর নির্দেশদাতা প্রতারক প্রতাপকেও আশীর্বাদ করেছেন। প্রতাপের পুত্র-কন্যাদের স্নেহধারা ঢেলে দিয়েছেন। তার কাছে আপন-পর, শত্রু-মিত্র সবাই সমান হয়ে গেছে। তার মধ্যে দিয়েই রবীন্দ্রনাথ বিশ্বপ্রেমের বানী প্রচার করেছেন। বিশিষ্ট সমালোচকের মতে মূলত বৈষ্ণবীয় ভাবনায় ভাবিত হয়েই রবীন্দ্রনাথ বসন্ত রায় চরিত্রটি গড়ে তুলেছেন – " বসন্ত রায় বৈষ্ণব বৈরাগীর মতই জীবন এবং মৃত্যু দুই-ই অত্যন্ত সহজভাবে নিয়েছেন এবং সংসারের আনন্দময় পথে নাচতে নাচতে গাইতে গাইতে চলেছেন। এই উপন্যাসের আকর্ষণ মূলত তিনিই এবং তাঁর বিশ্বপ্রেম।"[২৫] বসন্ত রায়ের এহেন বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে চৈতন্যদেবের ভক্তিধর্ম ও তাঁর মানবপ্রেমের সাদৃশ্য লক্ষ করা যায়।

চৈতন্য মহাপ্রভুর এই মানবপ্রেম, উদারতা, মানবধর্ম প্রতিষ্ঠার সুদূরপ্রসারী প্রতিফলন আমরা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'রাজর্ষি' উপন্যাসেও দেখতে পাই। এই উপন্যাস সম্পর্কে ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ নিজেই লিখেছেন – "আসলে গল্পটা ছিল প্রেমের অহিংস পূজার সঙ্গে হিংস্র শক্তি পূজার বিরোধ।" [২৬] এই বিরোধে অহিংস প্রেমই শেষ পর্যন্ত জয়লাভ করে। আর, এই অহিংস প্রেমধর্মই বৈষ্ণব ধর্মের তথা চৈতন্য ধর্মের মূল কথা। কোন প্রচলিত প্রথা, শাস্ত্র নির্দেশ নয়, অহিংস প্রেমধর্মেই জগৎবাসীকে উদ্ধার করতে চেয়েছিলেন চৈতন্যদেব এবং এই একই ভাবনায় ভাবিত ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। তারই প্রতিফলন দেখা যায় 'রাজর্ষি' উপন্যাসে। ভুবনেশ্বরী মন্দিরের পুরোহিত রঘুপতির বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে নানা প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হয়েও রাজা গোবিন্দমানিক্যের অক্লান্ত প্রচেষ্টায় ও নির্দেশে মন্দিরের দীর্ঘকাল ধরে প্রচলিত জীববলি প্রথা বন্ধ হয়ে যায় এবং সমগ্র নগরী প্রেমধারায় স্নিগ্ধ হয়ে ওঠে।

চৈতন্যদেবের প্রভাব সবচেয়ে বেশি লক্ষ করা যায় রবীন্দ্রনাথের 'গোরা' উপন্যাসের গোরা চরিত্র নির্মাণে। প্রথমেই চোখে পড়ে উভয়ের দেহসৌষ্ঠবের দিকে। চৈতন্যদেবের বিপুল জনপ্রিয়তার একটি অন্যতম কারণ অবশ্যই তাঁর দেহকান্তি। চৈতন্যচরিতকাব্যগুলি অনুসরণ করলে দেখা যায় শ্রীচৈতন্যদেব ছিলেন 'সিদ্ধপুরুষের প্রায় পরম গম্ভীর'। তাঁর 'সিংহগ্রীব গজস্কন্ধ', আজানুলম্বিত ভুজ কমল নয়ন' [২৭] সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করত। তাই তো রামানন্দ তাঁকে দেখে বলেছিলেন –

"সূর্যশত সমকান্তি অরুণ বসন।
সুবলিত প্রকাণ্ড দেহ কমল লোচন।।" [২৮]

আর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর গোরার রূপের বর্ণনা দিয়েছেন এইভাবে " তাহার গায়ের রঙটা কিছু উগ্র রকমের সাদা। ..... মাথায় সে প্রায় ছয় ফুট লম্বা, হাড় চওড়া, দুই হাতের মুঠা যেন বাঘের থাবার মতো বড়ো - ..... তাহার মুখের গড়নও অনাবশ্যক রকমের বড়ো এবং অতিরিক্ত রকমের মজবুত; ওষ্ঠাধর পাতলা এবং চাপা; তাহার উপরে নাকটা খাঁড়ার মতো ঝুঁকিয়া আছে। দুই চোখ ছোট কিন্তু তীক্ষ্ণ;" [২৯] গোরার দেহসৌষ্ঠব রচনায় অবশ্যই আমরা চৈতন্যদেবের প্রভাব লক্ষ করতে পারি। তাই তো গোরার 'হোমের আগুনের' মতো চেহারা দেখে বিস্মিত হরিমোহিনী বলেছিল – "তোমার কথা অনেক শুনেছি বাবা। তুমিই গৌর? গৌরই বটে। ঐ যে কীর্তনের গান শুনেছি –

"চাঁদের অমিয়া সনে চন্দন বাটিয়া গো
কে মাজিল গোরার দেহখানি –" [৩০]

চৈতন্যদেবের মতো রবীন্দ্রনাথের চেহারাতেও এমন অমোঘ আকর্ষণ ছিল যাকে এড়িয়ে যাবার সাধ্য কারও ছিল না। প্রত্যক্ষদর্শী রঘুনাথ দাসের কাছে চৈতন্যদেব 'হেমাদ্রি' রূপে প্রতিভাত হয়েছিলেন। 'গোরা' উপন্যাসের গৌরমোহনের মতোই রবীন্দ্রনাথের চেহারাও ছিল 'রজতগিরি'র মতো এবং "তাহাকে না দেখিয়া থাকিবার জো নাই, সে সকলের মধ্যে চোখে পড়িবেই ।" [৩১] ১৮৯৪ সালের ২রা সেপ্টেম্বর রবীন্দ্রনাথ শিলাইদহে যাবার সময় একবার নবীনচন্দ্রের আহ্বানে রানাঘাটে নামেন। এই উপলক্ষে নবীনচন্দ্রের 'আত্মজীবনী'তে বত্রিশ বৎসর বয়সের রবীন্দ্রনাথের একটি বর্ণনা আছে - "দেখিলাম সেই ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দের নবযুবকের আজ পরিণত যৌবন। কি সুন্দর, কি শান্ত, কি প্রতিভান্বিত দীর্ঘাবয়ব। উজ্জ্বল গৌরবর্ণ, স্ফুটনোন্মুখ পদ্মকোরকের মত দীর্ঘ মুখ, মস্তকের মধ্যভাগে বিভক্ত কুঞ্চিত ও সজ্জিত কেশশোভা; ... সুবর্ণোদর্পণোজ্জ্বল ললাট, ভ্রমরকৃষ্ণ গুম্ফ ও শ্মশ্রু শোভান্বিত মুখমণ্ডল; ... দীর্ঘ ও সমুজ্জ্বল চক্ষু; সুন্দর নাসিকায় মার্জিত সুবর্ণের চশমা।"[৩২]

কেবল দৈহিক সৌন্দর্যই নয়, গোরার সঙ্গে আমরা গৌরাঙ্গের জীবন ও কর্মধারার সাদৃশ্যও লক্ষ করতে পারি। নবদ্বীপের নিমাইয়ের ন্যায় রবীন্দ্রনাথের গোরাও ছোটবেলা থেকেই পাড়ায় ও স্কুলে ছেলেদের সর্দারি করত। তার দুরন্তপনায় সকলে অতিষ্ঠ হয়ে উঠত। আবার বয়সকালে যে কোনো সভায় বক্তৃতা দিতে, নিমাইয়ের মতো নেতৃত্বদানে এবং প্রতিপক্ষকে যুক্তি-তর্কে পরাস্ত করতে গোরা ছিল সিদ্ধহস্ত।

প্রথম দিকে গোরার মনে জাত-পাত নিয়ে গোঁড়ামি ছিল। হিন্দু সংস্কার, আচার-আচরণ, সে অক্ষরে অক্ষরে পালন করত। কিন্তু গোরা যখন ভ্রমণে বেরিয়ে ভদ্র শিক্ষিত কলকাতা সমাজের বাইরে গ্রামে গ্রামে ঘুরে দেশের প্রকৃত অবস্থা ও মানুষের দুর্দশা প্রত্যক্ষ করল তখন তার যাবতীয় সংস্কার এবং ধর্মীয় গোঁড়ামির মূলে কঠোর অভিঘাত লাগল। চরঘোষপুরে গিয়ে গোরা প্রথম উপলব্ধি করে জাত-পাতের বিচার, ধর্মীয় গোঁড়ামির উর্দ্ধে মানুষের স্নেহ-ভালবাসা, আবেগ-অনুভূতি, মানবিকতার গুরুত্ব অনেক বেশি। তাই ক্ষুধা-তৃষ্ণায় নিতান্ত ক্লান্ত হওয়া সত্ত্বেও দুর্বৃত্ত অন্যায়কারী মাধব চাটুয্যের বাড়িতে গোরা অন্নগ্রহণ, এমনকি জলস্পর্শ পর্যন্ত করে না। সে চলে যায় সেই নাপিতের বাড়ি যেখানে পিতৃহারা মুসলমানের ছেলে মানুষ হচ্ছে, যে নাপিত হিন্দুর হরি ও মুসলমানের আল্লার মধ্যে কোনো তফাৎ দেখে না। এইভাবে গোরার মধ্যে প্রকৃত ভারতবোধের উন্মেষ ঘটে।

এ প্রসঙ্গে আমাদের মনে পড়ে যায় শ্রীচৈতন্যদেবের কথা। ষোড়শ শতকে চৈতন্যদেবের মধ্যেই আমরা প্রথম হিন্দু-মুসলমান, ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত-বৈষ্ণব, উচ্চ-নীচ জাতি সকলকে একত্রিত করার মত নেতৃত্ব দানের শক্তি লক্ষ করে থাকি। তাঁর নেতৃত্বেই সেদিন নবদ্বীপের অসংখ্য মানুষ একত্রিত হয়ে কাজীর বিরুদ্ধে প্রতিবাদে বিরাট

শোভাযাত্রার আয়োজন করেছিল যা ছিল ভারতবর্ষের ইতিহাসে প্রথম 'গণ-আন্দোলন'। কাজীদলনের পর নগর ভ্রমণে বেরিয়ে নিমাই সমাজের পিছিয়ে পড়া মানুষ তাঁতী, গোয়ালা, গন্ধবণিক, মালাকার, শঙ্খবণিক, তাম্বুল বৃত্তিজীবীদের প্রত্যেকের ঘরে ঘরে গিয়ে অন্তরঙ্গতা স্থাপন করেন –

"নগরে আসিয়া করে বিবিধ বিলাস।
সবার সহিত করে হাসিয়া সম্ভাষ।।" [৩৩]

এমনকি খোলাবেচা শ্রীধরের বাড়িতে গিয়ে তার দুয়ারে পড়ে থাকা লোহার পাত্র থেকে জল পান করেন - "নৃত্য করে মহাপ্রভু শ্রীধর অঙ্গণে।/ জলপূর্ণ পাত্র প্রভু দেখিলা আপনে।।/ ভক্তপ্রেম বুঝাইতে শ্রীশচীনন্দন।/ লৌহপাত্র তুলি লইলেন ততক্ষণ।।/ জল পিয়ে মহাপ্রভু সুখে আপনার।/ কার শক্তি আছে তাহা নয় করিবার।।"[৩৪] শুধু সমাজের নিম্নশ্রেণির বৃত্তিজীবী মানুষদের অনুগ্রহ দানই নয়, সমাজের পতিত, অবহেলিত মানুষদের প্রতিও ছিল তার অগাধ করুণা। তাই গোবিন্দদাস কবিরাজ লিখেছেন – "পতিত হেরিয়া কাঁদে/ স্থির নাহি বাঁধে/ করুণ নয়নে চায়।" [৩৫] এ কথা বর্ণে বর্ণে সত্যি।

নিমাইয়ের এই চারিত্রিক গুনাবলী আমরা 'গোরা' উপন্যাসের গোরার চরিত্রেও দেখতে পাই। গোরা উপলব্ধি করেছিল যে সমাজ বাইরের রাষ্ট্রশক্তির ধাক্কায় ভেঙ্গে পড়েছে। তাকে পুনরুদ্ধার করতে হলে সমাজের অন্তর্নিহিত শক্তিকে জাগ্রত করতে হবে। আর তার জন্য প্রথম প্রয়োজন চারপাশে ছড়িয়ে থাকা ভাঙ্গা-চোরা মানুষগুলিকে কাছে টেনে নেওয়া, তাদের চেনা, জানা, ভালবাসা। তাই তো "গোরা প্রত্যহ সকালবেলায়.....পাড়ার নিম্ন শ্রেণীর লোকেদের ঘরে যাতায়াত করিত। তাহাদের উপকার করিবার বা উপদেশ দিবার জন্য নহে – নিতান্তই তাহাদের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করিবার জন্যই যাইত।"[৩৬] দেশের বৃহৎ ঐক্য স্থাপনের লক্ষ্যে গোরা এই অন্ধ, কুসংস্কারাচ্ছন্ন, মূঢ় মানুষগুলির সঙ্গে হৃদয়ের সম্পর্ক স্থাপনের জন্য কখনো ঝাঁকাওয়ালা বৃদ্ধ মুসলমানের দুঃখকে আপন করে নিতে চেয়েছে, কখনো নগরভ্রমণে বেরিয়েছে, কখনো জাহাজে উঠতে যাত্রীদের সাহায্য করেছে, কখনো ত্রিবেণীতে গঙ্গাস্নানে সকল তীর্থযাত্রীদের সঙ্গে মেতে উঠেছে এই কারণে যে "সেই জনসাধারণের সঙ্গে গোরা নিজেকে এক করিয়া মিলাইয়া দেশের একটি বৃহৎ প্রবাহের মধ্যে আপনাকে সমর্পণ করিতে ও দেশের হৃদয়ের আন্দোলনকে আপনার হৃদয়ের মধ্যে অনুভব করিতে চায়..... সাধারণের সঙ্গে সমান ক্ষেত্রে নামিয়া দাঁড়াইয়া মনে মনে বলিতে চায় 'আমি তোমাদের, তোমরা আমার'।" [৩৭] উপন্যাসের অন্তিম মুহূর্তে গোরা পরেশবাবুকে বলেছে – "আমি আজ ভারতবর্ষীয়, আমার মধ্যে হিন্দু মুসলমান খৃষ্টান কোন সমাজের কোন বিরোধ নেই। আজ এই ভারতবর্ষের সকল জাতই আমার জাত, সকলের অন্নই আমার অন্ন। ... আজ আমি এমন শুচি হয়ে উঠেছি যে চণ্ডালের ঘরেও আমার অপবিত্রতার ভয় রইল না।" [৩৮] এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য শ্রীচৈতন্যদেব বলতেন 'চণ্ডালোহপি দ্বিজশ্রেষ্ঠ হরিভক্তি পরায়ণঃ।'তাই এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে গোরার চরিত্র নির্মাণে মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের জীবনের প্রথমার্ধের প্রভাব অবশ্যই ছিল।

এইভাবে চৈতন্যদেব ও তাঁর ভক্তিধর্মের গভীর ও ব্যাপক প্রভাব আমরা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জীবনচর্চায় ও তাঁর সৃষ্ট সাহিত্য গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ, কবিতা, নাটক, এমনকি গানেও পূর্ণমাত্রায় লক্ষ করতে পারি। দুই যুগের দুই মহাপুরুষ সম্পূর্ণ বিপরীত স্বভাবের হলেও উভয়েই মানবপ্রেম তথা মনবধর্মই সমাজে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন এবং উভয়েই রেণেসাঁস তথা নবজাগরণের প্রতীক। তাই এই দুই যুগপুরষ আমাদের চিরস্মরণীয়, চিরনমস্য।

তথ্যসূত্র –

(১) ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ, রবীন্দ্র রচনাবলী, একাদশ খণ্ড, চারিত্রপূজা, বিদ্যাসাগর চরিত, বিশ্বভারতী, পৃ-৩৩৯।

(২) ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ, চিঠিপত্র, দ্বিতীয় খণ্ড, পত্র ৬, বিশ্বভারতী, পৃ- ৫২৮।
(৩) তদেব।
(৪) তদেব।
(৫) তদেব।
(৬) তদেব, পৃ- ৫২৯।
(৭) ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ, রবীন্দ্র রচনাবলী, প্রথম খণ্ড, মানসী, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, পৃ- ৩২০।
(৮) তদেব, পৃ- ৩৩২।
(৯) তদেব, সোনার তরী, বর্ষাযাপন, পৃ- ৪৫২।
(১০) তদেব, বৈষ্ণব কবিতা, পৃ- ৪৬০-৪৬১।
(১১) তদেব।
(১২) সেন সুকুমার ও মুখোপাধ্যায় তারাপদ (সম্পা), কৃষ্ণদাস কবিরাজ বিরচিত 'শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত', মধ্যলীলা, একবিংশ পরিচ্ছেদ, আনন্দ পাবলিশার্স, পৃ- ৩২২।
(১৩) ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ, রবীন্দ্র রচনাবলী, প্রথম খণ্ড, সোনার তরী, বৈষ্ণব কবিতা, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, পৃ- ৪৬১।
(১৪) সেন সুকুমার (সম্পা), বৃন্দাবন দাস বিরচিত 'শ্রীচৈতন্যভাগবত', মধ্যখণ্ড, অষ্টাদশ অধ্যায়, সাহিত্য অকাদেমি, পৃ- ১৬১।
(১৫) পাল প্রশান্তকুমার, রবিজীবনী, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ- ১২২।
(১৬) মজুমদার উজ্জ্বলকুমার, ১৪০০, রবীন্দ্রনাথ সৃষ্টির উজ্জ্বলস্রোতে, পৃ- ১৭৯।
(১৭) ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ, গীতবিতান, গীতলিপি-১, গীতাঞ্জলি, স্বরবিতান ৩৮, বিশ্বভারতী, পৃ-১৩৪।
(১৮) তদেব, ব্রহ্মসঙ্গীত ৬, বৈতালিক, গীতাঞ্জলি, স্বর ২৬, বিশ্বভারতী, পৃ- ৭৬।
(১৯) তদেব, গীতবিতান, স্বরবিতান ৬০, পৃ- ১৪৮।
(২০) তদেব, গীতলিপি-৫, গীতাঞ্জলি, স্বর ৩৭, পৃ- ৭২।
(২১) তদেব, গীতবিতান ১০৫, স্বরবিতান ৪০, পৃ- ৪৮।
(২২) তদেব, গীতবিতান ৬৫, গীতলিপি ৪, গীতাঞ্জলি, স্বরবিতান ৩৭, পৃ- ৩২।
(২৩) সেন সুকুমার ও মুখোপাধ্যায় তারাপদ (সম্পা), কৃষ্ণদাস কবিরাজ বিরচিত 'শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত', আদিলীলা, চতুর্থ পরিচ্ছেদ, আনন্দ পাবলিশার্স, পৃ- ২১।
(২৪) তদেব, মধ্যলীলা, ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ, আনন্দ পাবলিশার্স, পৃ- ১৬১।
(২৫) রায় অনিলকুমার, প্রাগাধুনিক বাংলা সাহিত্য ও রবীন্দ্রনাথ, চ্যাটার্জী পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৯৯৪, পৃ- ৭৪।
(২৬) ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ, রবীন্দ্র উপন্যাস সংগ্রহ, রাজর্ষি, বিশ্বভারতী, পৃ- ১০৫।
(২৭) সেন সুকুমার (সম্পা), বৃন্দাবন দাস বিরচিত 'শ্রীচৈতন্যভাগবত', আদিখণ্ড, একাদশ অধ্যায়, সাহিত্য অকাদেমি, পৃ- ৫২।
(২৮) সেন সুকুমার ও মুখোপাধ্যায় তারাপদ (সম্পা), কৃষ্ণদাস কবিরাজ বিরচিত 'শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত', মধ্যলীলা, অষ্টম পরিচ্ছেদ, আনন্দ পাবলিশার্স, পৃ- ১৭৫।
(২৯) ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ, রবীন্দ্র রচনাবলী, তৃতীয় খণ্ড, গোরা, বিশ্বভারতী, পৃ- ৩৮৩।
(৩০) তদেব, পৃ- ৫৯০।
(৩১) তদেব, পৃ- ৩৮৩।

(৩২) মুখোপাধ্যায় প্রভাতকুমার, রবীন্দ্রজীবনকথা, আনন্দ, পৃ- ৪৫।
(৩৩) সেন সুকুমার (সম্পা), বৃন্দাবন দাস বিরচিত 'শ্রীচৈতন্যভাগবত', আদিখণ্ড, দশম অধ্যায়, সাহিত্য অকাদেমি, পৃ- ৪৬।
(৩৪) তদেব, মধ্যখণ্ড, ত্রয়োবিংশ অধ্যায়, সাহিত্য অকাদেমি, পৃ- ১৯৩।
(৩৫) সেন সুকুমার ও মিত্র খগেন্দ্রনাথ (সম্পা), বৈষ্ণব পদাবলী (চয়ন), কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ২০১১, পৃ- ৭।
(৩৬) ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ, রবীন্দ্র রচনাবলী, তৃতীয় খণ্ড, গোরা, বিশ্বভারতী, পৃ- ৪৩৭।
(৩৭) তদেব, পৃ- ৩৯৮।
(৩৮) তদেব, পৃ-৬৬৪।